জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু স্বাভাবিকভাবে নেবার নিশ্চয়তা দিন

এক-দুটি নয়, পাচশোর মতো বোমা এবং তার মাঝে শুধু বিস্ফোরিত বোমার সংখ্যাই ৩৯৩। আক্রান্ত এলাকার মাঝে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেটসহ শুধুমাত্র মুন্সিগঞ্জ ছাড়া দেশের সবকটি জেলাসদর রয়েছে। এতোদিন আমরা যারা ৯/১১ এবং ৭/৭ সংক্রান্ত খবর সিএনএন-বিবিসিতে দেখেছি, যাদের স্মৃতিতে একুশে আগস্টের বোমা হামলা, শাহ কিবরিয়ার উপর বোমা হামলা, ব্রিটিশ হাই কমিশনারের উপর বোমা হামলা, খড়মপুরের দরগায় বোমা হামলা, আহমদিয়াদের বাড়ীতে বোমা হামলা ইত্যাদি রয়েছে, তাদের কাছেও এক বিপুল বিস্ময় ছিলো যে, সারা দেশজুড়ে এমন একটি ঘটনা এমন নিখুঁতভাবে কেমন করে ঘটতে পারে! এতোসবে আতঙ্কে জমে যাবার মতো অবস্থা নয়কি?

এতোদিন আমরা ভাবতাম, ছোটখাটো স্থানে একটি দুটি বোমা ফাটিয়ে কে বা কারা পালিয়ে যায়, পুলিশ তাদের খুঁজে পায়না-এটি হয়তো হতেই পারে। আমাদের পুলিশতো আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড নয় যে, তারা সব খবরই রাখবে। সুতরাং এইসব বোমা হামলাকারীদের হয়তো তারা খুঁজে পাচ্ছেনা। কিন্তু পুরো দেশজুড়ে ৫০০ বোমা বানানো, জায়গা মতো সেইসব বোমা পৌছানো এবং ৩৯৩টি বোমা ফাটানোর মতো এতোবড়ো একটি বিশাল ঘটনা ঘটার কোন খবরও পুলিশ জানেনা -এমন কেমন জাতীয় রক্ষা ব্যবস্থার মাঝে বসবাস করছি আমরা? -বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে বোমাগুলো রাখার ৩০ সেকেন্ডর মাঝে সেগুলো ফেটেছে। যদি তাই হয়, তবে বোমাবহনকারীরা বোমা হামলার স্থান থেকে খুব বেশী দূরেও যেতে পারেনি। তিরিশ সেকেণ্ডে কতদূর আর যাওয়া যায়? তবুও বোমা হামলার স্থান থেকে পুলিশ একটি মানুষকেও (ঢাকায় আহত হয়ে পড়ে থাকা একজন ব্যতীত) কেন আটকাতে পারলোনা? কেনইবা বোমা হামলার রাতেই চেকপোস্ট পুলিশ শূণ্য করা হলো?

আমাদের জানা আছে, পুরো এক বছরেও পুলিশ একুশে আগষ্টের গ্রেনেড হামলার ২২ খুনের ঘটনার কোন কূল কিনারা করতে পারেনি। প্রকাশ্য দিবালোকে বঙ্গবন্ধু এভেনিউর মতো স্থানে হাজার হাজার মানুষের চোখের সামনে এমন প্রচণ্ড বোমা হামলা হলো, তার কোন হদিসই সরকার করতে পারলোনা। বরং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী টিভি ক্যামেরার সামনে বলে বেড়ালেন, “উই আর লুকিং ফর শত্রুজ”। সেই শত্রু তিনি এক বছরেও খুঁজে পেলেন না। লোকে বলে, আপনি যদি আপনার খোজার

বস্তু বগলে লুকিয়ে রাখেন, তবে রাস্তাঘাটে তাকে কোথায় পাওয়া যাবে। এর মানে হতে পারে যে, শত্রু হয়তো সরকারের বগলেই বহাল তবিয়তে আছে।

আমরা জানি, হযরত শাহজালালের মাজারের বোমা হামলারও কোন কিনারা করতে পারেনি সরকারী বাহিনী। বরং শাহজালালের পবিত্র মাজারের পর দেশের আরো অনেক মাজারে বোমা হামলা হয়েছে। সর্বশেষটি হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খড়মপুরে। এইসবের কোন কূল কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। এমনকি শাহজালালের বোমা হামলার সাথে একজন কূটনীতিক জড়িত থাকার পরেও সরকার এখন পর্যন্ত সেই হামলার ব্যাপারে প্রকৃত কোন তথ্য দিতে পারেননি। ব্রিটিশ হাই কমিশনার নিজে এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার বক্তব্য দেবার পরেও সেই হামলার তদন্তে কোন অগ্রগতি নেই। এর ফলে দেশে-বিদেশে কোথাও আমাদের নিজেদের কোন মান সম্মান বলতে কিছু নেই।

শাহ কিবরিয়ার উপর বোমা হামলার সঠিক তদন্তও সরকার ও তার পুলিশ বাহিনী করতে পারেনি।

আমরা ভেবেছি, এইসব ঘটনার পেছনে রাজনীতি আছে এবং সরকার রাজনীতির সেইসব জট খুলতে চায়না-সম্ভবত এটিই পুলিশের ব্যর্থতার কারণ।

কিন্তু এভাবে সারা দেশে বোমা ফাটবে এবং পুলিশ কিছুই করতে পারবেনা-সেটি আমরা কেমন করে মানি। দেশের ১৫ কোটি মানুষের জানমালের নিরাপত্তা যে সরকারের হাতে, সেই সরকার যদি দেশের মানুষের প্রতি সামান্য দায়িত্ববান হয় তবে এতোসব হামলার পর কেমন করে এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকে? কেমন করে এমন ঘটনার পরও সরকার প্রধান বেজিং-এ সম্বর্ধনা গ্রহণ করতে ব্যস্ত থাকতে পারেন? ১৯ আগস্ট ২০০৫ জানা গেলো যে, শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী তার সফর সংক্ষিপ্ত করছেন এবং দেশে ফিরছেন। কিন্তু তিনি বিদেশে থাকাকালেই তার সরকারের লোকজন চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিলো, যখন তারা এই বোমা হামলাকে শেখ হাসিনার কাজ বলে চালাতে চেষ্টা করলো। সভা-সমাবেশ-মিছিল করে তারা চিৎকার করে বললো যে, দেশব্যাপী এই বোমা হামলা আওয়ামী লীগ করেছে। বোমাহামলার দিনই বিএনপির মিছিল থেকে এমনকি শেখ হাসিনাকে খুনী বলে শ্লোগান দেয়া হলো।

শুধু বিএনপি নয়, জামাত পর্যন্ত সভা-সমাবেশ করে বলার চেষ্টা করলো যে, বোমা হামলা শেখ হাসিনা করিয়েছে। পুলিশের দায়িত্বশীল লোকজন বলার চেষ্টা করলো যে, বোমার সাথে লিফলেট পেলেই এটি যে জেএমবির কাজ সেটি বলা যাবেনা। কার্যত সরকার ও তার মিত্র জামাত মৌলবাদীদের আড়াল করে আওয়ামী লীগের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা নেবার চেষ্টা করলো। অথচ তাদেরই

গ্রেফতার করা লোকজন মাত্র ২৪ ঘণ্টার মাঝেই পুলিশের কাছে স্বীকার করছে যে, জমিয়েতুল মুজাহেদিন নামক নিষিদ্ধ ঘোষিত মৌলবাদী একটি সংগঠনই সারাদেশে বোমা হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে। একই সাথে এখন সারাদেশে পুণরায় বোমা হামলার আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এমন একটি অবস্থায় সরকারের একটি মানুষও তার ব্যর্থতার দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারলোনা যে, মানুষের কাছে তার কিছু দায়বদ্ধতা আছে? সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা ক্যামেরার সামনে এসে বলে বেড়াচ্ছেন যে, সরকার সর্বশক্তি দিয়ে জনগণের সম্পদ রক্ষা করবে। কিন্তু বিগত চার বছরে এদেশের একটি মানুষ কি একদিন-একরাত-একবেলা শান্তিতে ঘুমাতে পেরেছে? সন্ত্রাসের জনপদের মাঝে র‌্যাব নামিয়ে তিনি মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে পারলেন, জনমনে শান্তি দিতে পারলেন না। এই চরম ব্যর্থতার জন্য আত্মসম্মানবোধ থাকলে কেউ মন্ত্রীত্বের গদি আকড়ে থাকতে পারেনা।

আমরা মনে করি, ১৭ই আগস্টের বিশাল বোমা হামলার আগে নিশ্চয়ই পরিকল্পনা হয়েছে। পরিকল্পনা করার জন্য কিছু লোক একত্রে বসেছে। পত্রিকায় খবরে জানা গেছে যে, ১৩ই আগস্ট তারা মিটিং করেছে। তারা নিশ্চয়ই এক দুই মিনিটের জন্য সেই সভায় বসেনি। হয়তো ঘন্টার পর ঘণ্টা সভা করেছে। হয়তো একটি সভা করেনি। অনেকগুলো সভা করেছে। হয়তো এক জায়গাতে মিটিং করেনি। অনেক জায়গায় তারা মিটিং করেছে। এই লোকগুলো হয়তো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাচল করেছে। তারা নিশ্চয়ই পাবলিক যানবাহন ব্যবহার করেছে। তারা নিশ্চয়ই পুলিশের সামনে দিয়েই এই কাজগুলো করেছে। অন্যদিকে যদি চার হাজার একশো টাকা (একটি পত্রিকার হিসাবে তাই বলা হয়েছে) করেও একটি বোমা বানাতে খরচ পড়ে, তবে তারা কমপক্ষে ২০ লাখ টাকা এই খাতে খরচ করেছে। কমপক্ষে ১ হাজার লোক এই কাজের সাথে জড়িত ছিলো। তাদেরকে নিশ্চয়ই কোন না কোন অঙ্কের টাকা দিতে হয়েছে। সব মিলিয়ে কোটি টাকার নীচে এমন একটি ঘটনা ঘটানো সম্ভব হয়নি। খুব সঙ্গত প্রশ্ন হচ্ছে, এতো টাকা এলো কোত্থেকে? সাধারণ মানুষের কাছে একটি সহজ প্রশ্ন, কেন বাবর সাহেবের লোকজন এতোসব ঘটনার কোন হদিসই করতে পারেনি। অকর্ম্মণ্যতা আর কাকে বলে!

দেশে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ আছে। পুলিশ আছে-পুলিশের সোর্স আছে। পুলিশতো আইনী-বেআইনীভাবে জনগণের টাকা খায়ই, সোর্সরাও জনগণের শত শত কোটি টাকা খায়। তার উপরে দেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এনএসআই (ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স) আছে। ডিবি আছে। এসবি আছে। সামরিক

গোয়েন্দা বিভাগ আছে, যারাও জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে কাজ করে। দেশে সুপারবাহিনী এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট র‌্যাব আছে। তাদেরও গোয়েন্দা বিভাগ আছে। শুনেছি ইদানিং তাদের গোয়েন্দা শাখাকে আরো আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করা হয়েছে। এতোসব গোয়েন্দা বিভাগের জন্য আমরা বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করি। অথচ আমরা কারো কাছ থেকেই কোন আগাম সংবাদই পেলামনা। কোন বাহিনী কোন ধরনের সতর্কতা গ্রহণ করতে পারলোনা। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং পুলিশ কর্মকর্তারা ১৪, ১৫, ১৬ আগস্ট কল্পিত একটি হামলার সতর্কতা তৈরী করলো। আর ঘটনা ঘটলো তার পরদিন ১৭ আগস্ট, যেদিন তারা ঘুমাচ্ছিলো।

মানুষ বাড়ীতে নিরাপদ নয়, রাস্তায় নিরাপদ নয়। অফিসে নিরাপদ নয়। আদালতে নিরাপদ নয়। টেক্সিতে নিরাপদ নয়, বাসে নিরাপদ নয়, ট্রেনে নিরাপদ নয়। শরীরে নিরাপদ নয়- মনে নিরাপদ নয়- সম্পদেও নিরাপদ নয়।

এই নিরাপত্তাহীনতা প্রতিদিন আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। কখনো কখনো নিজের নিরাপত্তার চেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন- বন্ধু বান্ধবের নিরাপত্তার বিষয়গুলো। গত ১৭ই আগস্ট এমনি করে সারা দেশের মানুষ খুজেছে তাদের প্রিয়জনকে। কিন্তু কার কাছে নিরাপত্তা পাবো। অন্য অর্থে বলা যায়, কার কাছে নিরাপত্তা চাইবো?

আইন-আদালত-বিচার কোথাও কি কিছু আছে? পত্রিকার পাতায় সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ, নির্যাতন, নিপীড়নের দুঃখগাথা পড়তে পড়তে প্রায়ই চোখে পানি এসে যায়। সেদিন টিভিতে দেখলাম, এক কিশোর আলমগীরকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসার সময় পুলিশ হত্যা মামলার আসামী করে জেলে পুরে দিয়েছে। আলমগীরের মা জানেনা, কবে তার ছেলে এই মিথ্যা মামলা থেকে বেরোতে পারবে। দেশে বিরোধীদল যদি কোন কর্মসূচী প্রদান করে তবে শুরু হয় গণগ্রেফতার। উচ্চ আদালত নিষিদ্ধ করলেও সেই নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নিরীহ-গরীব মানুষদেরকে কোমরে দড়ি বেধে নেয়া হয় থানায়। যেখানে বাণিজ্য চলে। তারপর বিনা অপরাধে জেল খাটা। এ এক অসহ্য যন্ত্রণা।

আমি একথা বলবোনা যে, সমাজে অপরাধ থাকবেনা। খুন-খারাবি-রাহাজানি-ধর্ষণ এইসব পুরো উচ্ছেদ হয়ে যাবে- এটি প্রায় অসম্ভব। উন্নত দেশগুলোতেও অপরাধ আছে। কিন্তু আমাদের সাথে উন্নত দেশগুলোর পার্থক্য হচ্ছে, অপরাধের মাত্রায় ও দমনে। জার্মানী, ফ্রান্স বা সুইডেন-নরওয়ের মতো দেশে বা চীন-সিঙ্গাপুর-জাপানে অপরাধ নেই, বলা যায় না। তবে অপরাধের মাত্রা এতো কম যে, তা হিসেবেই পাড়েনা। উপরন্তু সেইসব দেশের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো যে, মানুষ অপরাধের

পর বিচার পায়। পুলিশ মানুষের বন্ধু এবং নিরাপত্তাদনকারী এই বোধুটুকু সেখানে কাজ করে। মানুষ জানে, অপরাধী অপরাধ করে ফেলতে পারে। কিন্তু মানুষ এটিও জানে যে, অপরাধ করার পরেও অপরাধী পার পাবেনা। পুলিশ অপরাধীর পক্ষে যাবেনা বা আইন তাকে খুঁজবে। পুলিশ খুঁজবে বলেই একদিন অপরাধী ধরা পড়বে। পুলিশ তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাড় করাবে এবং আদালত তার বিচার করবে। আমরা আমাদের পুলিশ বাহিনী বা নিরাপত্তাদানকারীদের উপর সেই ভরসাটুকু করতে পারিনা। আমাদের পুলিশতো খুজেইনা, বরং আদালতও বিচার করতে গিয়ে বিব্রত হয়ে যায়। আর যদি কোনমতে আদালত শাস্তি দেয়ও, রাজনৈতিক বিবেচনায় সে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায় দণ্ড মওকুফ করতে পারে। আমাদের দেশের আরো একটি বিপদ হলো যে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা নিজেরাই অপরাধী হয়ে পড়ে। জনকণ্ঠের খবরে প্রকাশ, বিগত ৪ বছরে ২৯৩২০ জন পুলিশ অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হয়। তারা চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-রাহাজানি-হেন অপরাধ নেই, যাতে জড়িত হয়নি। অথচ এর মাঝে শাস্তি পেয়েছে মাত্র ২৩১ জন। অর্থাৎ অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ২৯ হাজার পুলিশ এখনো আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত। আমাদের শঙ্কা, আমাদের ভয় এজন্যেই। আমরা না পারি আইনের কাছে আশ্রয় নিতে, না পারি আইন রক্ষাকারীর কাছে আশ্রয় নিতে। আমাদের দেশেই এমনকি জেল হত্যার দৃষ্টান্তও আছে। আমাদের দেশেই আবার বিচারের নামে তাহের হত্যারও দৃষ্টান্ত আছে।

ফলে মনকে কোনভাবেই বোঝানো যায় না যে, একটি নিরাপদ দেশে আমরা বসবাস করছি। বরং প্রতিক্ষণ-প্রতি মুহর্তে ভয় থাকে কোনদিন অপরাধ আমার ঘরে ঢুকে পড়বে?

যাহোক, আমরা যারা প্রতি মুহর্তেই নিজের এবং আত্মীয় পরিজনের জীবনের জন্য উদ্বিগ্ন থাকি, তাদের একটি মাত্র আবেদন, অনুগ্রহ করে স্বাভাবিকভাবে জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু নেবার নিশ্চয়তা দিন।

১৯ আগস্ট ২০০৫॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ০৬ সম্পাদিত